ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি

২রা জানুয়ারি

আজ সকালটা বড় সুন্দর। চারিদিকে ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে সাদা সাদা হৃষ্টপুষ্ট মেঘ, দেখে মনে হয় যেন ভুল করে শরৎ এসে পড়েছে। সদ্য-পাড়া মুরগির ডিম হাতে নিলে যেমন মনটা একটা নির্মল অবাক আনন্দে ভরে যায়, এই আকাশের দিকে চাইলেও ঠিক তেমনই হয়।

আনন্দের অবিশ্যি আরেকটা কারণ ছিল। আজ অনেক দিন পরে বিশ্রাম। আমার যন্ত্রটা আজই সকালে তৈরি হয়ে গেছে। বাগান থেকে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে একটা গভীর প্রশান্তি অনুভব করছি। জিনিসটা বাইরে থেকে দেখতে তেমন কিছুই নয় ; মনে হবে যেন হাল ফ্যাশানের একটা টুপি বা হেলমেট। এই হেলমেটের খোলের ভিতর রয়েছে বাহাত্তর হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের জটিল স্নায়বিক বিস্তার। সাড়ে তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই যন্ত্র। এটা কী কাজ করে বোঝানোর জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিই।

এই কিছুক্ষণ আগেই আমি চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আমার চাকর প্রহ্লাদ এসেছিল কফি নিয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গত মাসের ৭ই সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে ?' প্রহ্লাদ মাথাটাথা চুলকে বলল, 'এজ্ঞে সে তো স্মরণ নাই বাবু !' আমি তখন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হেলমেটটা মাথায় পরিয়ে দিয়ে একটা বোতাম টিপতেই প্রহ্লাদের শরীরটা মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো একটা নিষ্পলক দৃষ্টিহীন চেহারা নিল। এবার আমি তাকে আবার প্রশ্নটা করলাম।

'প্রহ্লাদ, গত মাসের সাত তারিখ সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে ?'

প্রশ্নটা করতেই প্রহ্লাদের চাহনির কোনও পরিবর্তন হল না ; কেবল তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভটা নড়ে উঠে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হল— 'ট্যাংরা'।

টুপি খুলে দেবার পর প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে একগাল হেসে বলল, 'মনে পড়েছে বাবু— ট্যাংরা !'

এইভাবে শুধু প্রহ্লাদ কেন, যে কোনও লোকেরই যে কোনও হারানো স্মৃতিকে এ যন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারে। একজন সাধারণ লোকের মাথায় নাকি প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০— অর্থাৎ এক কোটি কোটি—স্মৃতি জমা থাকে, তার কোনওটা স্পষ্ট কোনওটা আবছা। তার মধ্যে দৃশ্য, ঘটনা, নাম, চেহারা, স্বাদ, গন্ধ, গান, গল্প, অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য—সব কিছুই থাকে। সাধারণ লোকের দু' বছর বয়সের আগের স্মৃতি খুব অল্প বয়সেই মন থেকে মুছে যায়। আমার নিজের স্মরণশক্তি অবিশ্যি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। আমার এগারো মাস বয়সের ঘটনাও কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কয়েকটা খুব ছেলেবেলার স্মৃতি আমার মনেও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। যেমন এক বছর তিন মাস বয়সে একবার এখানকার সে যুগের ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকওয়েল সাহেবকে ছড়ি হাতে কুকুর

নিয়ে উশ্রীর ধারে বেড়াতে দেখেছিলাম। কুকুরটার রং ছিল সাদা, কিন্তু জাতটা মনে ছিল না। আজ যন্ত্রটা মাথায় দিয়ে দৃশ্যটা মনে করতেই তৎক্ষণাৎ কুকুরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে জানিয়ে দিল সেটা ছিল বুল টেরিয়ার।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি রিমেমব্রেন। অর্থাৎ ব্রেন বা মস্তিষ্ককে যে যন্ত্র রিমেমবার বা স্মরণ করতে সাহায্য করে। কালই এটার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি ইংল্যান্ডের নেচার পত্রিকায়। দেখা যাক কী হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

আমার লেখাটা নেচারে বেরিয়েছে, আর বেরোনোর পর থেকেই অজস্র চিঠি পাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া জাপান সব জায়গা থেকেই যন্ত্রটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ৭ই মে ব্রাসেল্‌স শহরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে সেখানে যন্ত্রটা ডিমন্‌স্ট্রেট করার জন্য অনুরোধ এসেছে। এমন একটা যন্ত্র যে হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না, যদিও আমার ক্ষমতার কথা এরা অনেকেই জানে। আসলে হয়েছে কী, স্মৃতির গূঢ় রহস্যটা এখনও বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। আমি নিজেও শুধু এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে কোনও একটা তথ্য মাথার মধ্যে ঢুকলেই সেটা সেখানে স্মৃতি হিসাবে নিজের জন্য খানিকটা জায়গা করে নেয়। আমার বিশ্বাস, এক একটি স্মৃতি হল এক একটি পরমাণুসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ, এবং প্রত্যেক স্মৃতিরই একটি করে আলাদা রাসায়নিক চেহারা ও ফরমুলা আছে। যত দিন যায়, স্মৃতি তত ঝাপসা হয়ে আসে, কারণ কোনও পদার্থই চিরকাল এক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমার যন্ত্র মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করে স্মৃতি নামক পদার্থটিকে তাজা করে তুলে পুরনো কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকে প্রশ্ন করবে, স্মৃতির রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ না করেও আমি কী করে এমন যন্ত্র তৈরি করলাম। উত্তরে বলব যে, আজকের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে যতটা জানি, আজ থেকে একশো বছর আগে তার সিকি ভাগও জানা ছিল না, অথচ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আশ্চর্য আশ্চর্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরি হয়েছে আমার রিমেমব্রেন যন্ত্র।

নেচারে লেখাটা বেরোবার ফলে একটা চিঠি পেয়েছি, যেটা আমার ভারী মজার লাগল। আমেরিকার ক্রোড়পতি শিল্পপতি হিরাম হোরেনস্টাইন জানিয়েছেন যে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসে দেখছেন যে তাঁর সাতাশ বছর বয়সের আগের ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে না। আমার যন্ত্র ব্যবহার করে এই সময়কার ঘটনাগুলো মনে করতে পারলে তিনি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন। শৌখিন মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের শখ মেটানোর জন্য আমি এ যন্ত্র তৈরি করিনি— এই কথাটাই তাঁকে আমি একটু নরম ভাষায় লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

৪ঠা মার্চ

আজ খবরের কাগজে সুইটজারল্যান্ডের একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্টের কথা পড়ে মনটা ভার হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে বিষয়ে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে হাজির। একেই বোধ হয় বলে টেলিপ্যাথি। খবরটা হচ্ছে এই— একটা গাড়িতে দু'জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক— সুইটজারল্যান্ডের অটো লুবিন ও অস্ট্রিয়ার ডক্টর হিয়েরোনিমাস শেরিং—অস্ট্রিয়ার লান্ডেক শহর থেকে সুইটজারল্যান্ডের ওয়ালেনস্টাট শহরে আসছিলেন। এই দুই বৈজ্ঞানিক কিছু দিন

থেকে কোনও একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে সামনে ছিল ড্রাইভার, পিছনে লুবিন আর শেরিং। পাহাড়ের পথ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি খাদে পড়ে। নিকটবর্তী গ্রামের এক মেষপালক চূর্ণবিচূর্ণ গাড়িটিকে দেখতে পায় রাস্তা থেকে হাজার ফুট নীচে। গাড়ির কাছাকাছি ছিল লুবিনের হাড়গোড় ভাঙা মৃতদেহ। আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন ডক্টর শেরিং। রাস্তা থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নীচে একটি ঝোপে আটকে যায় তাঁর দেহ। দুর্ঘটনার খবর ওয়ালেনস্টাটে পৌঁছানো মাত্র সুইস বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। লুবিন ও শেরিং বুশের কাছেই যাচ্ছিলেন কিছু দিনের বিশ্রামের জন্য। বুশ তাঁর সুপ্রশস্ত মার্সেডিস গাড়িতে শেরিংকে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। এইটুকু খবর কাগজে বেরিয়েছে। বাকিটা জেনেছি বুশের টেলিগ্রামে। এখানে বলে রাখি যে বুশকে আমি চিনি আজ দশ বছর থেকে ; ফ্লোরেন্সে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। বুশ লিখেছে— যদিও শেরিং-এর দেহে প্রায় কোনও জখমের চিহ্ন নেই, তার মাথায় চোট লাগার ফলে তার মন থেকে স্মৃতি জিনিসটাই নাকি বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে। আরও একটা খবর এই যে, গাড়ির ড্রাইভার নাকি উধাও এবং সেই সঙ্গে গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র। শেরিং-এর স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ডাক্তার, মনস্তাত্ত্বিক, হিপ্‌নটিস্ট ইত্যাদির চেষ্টা নাকি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বুশ আমাকে পত্রপাঠ আমার যন্ত্রসমেত ওয়ালেনস্টাট চলে যেতে বলেছে। খরচপত্র সেই দেবে। টেলিগ্রামের শেষে সে বলছে— 'ডঃ শেরিং একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারলে বিজ্ঞানীমহল তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কী স্থির কর সত্বর জানাও।'

আমার যন্ত্রের দৌড় কত দূর সেটা দেখার এবং দেখাবার এমন সুযোগ আর আসবে না। ওয়ালেনস্টাট যাবার তোড়জোড় আজ থেকেই করতে হবে। আমার যন্ত্র ষোলো আনা পোর্টেবল। এর ওজন মাত্র আট কিলো। প্লেনে অতিরিক্ত ভাড়া দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

৮ই মার্চ

আজ সকালে জুরিখে পৌঁছে সেখান থেকে বুশের মোটরে করে মনোরম পাহাড়ি পথ দিয়ে ৬০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট ওয়ালেনস্টাট শহরে এসে পৌঁছোলাম পৌনে নটায়। একটু পরেই প্রাতরাশের ডাক পড়বে। আমি আমার ঘরে বসে এই ফাঁকে ডায়রি লিখে রাখছি। গাছপালা ফুলেফলে ভরা ছবির মতো সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চোদ্দো একর জমির উপরে বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল। আমি দোতলায় পশ্চিমের একটা ঘরে রয়েছি, ঘরের জানালা খুললেই পাহাড়ে ঘেরা ওয়ালেন লেক দেখা যায়। আমার যন্ত্রটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাটের পাশেই একটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না। এইমাত্র বুশের তিন বছরের ছেলে উইলি আমাকে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে গেল। ছেলেটি ভারী মিষ্টি ও মিশুকে— আপন মনে ঘুরে ঘুরে সুর করে ছড়া কেটে বেড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে সকলকে অভিবাদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা কালো চুরুটের কেস সামনে ধরে বলল, 'সিগার খাবে?' আমি ধূমপান করি না, কিন্তু উইলিকে নিরাশ করতে ইচ্ছে করল না, তাই ধন্যবাদ দিয়ে একটা চুরুট বার করে নিলাম। খেলে অবিশ্যি এ রকম চুরুটই খেতে হয় ; অতি উৎকৃষ্ট ডাচ সিগার।

এ বাড়িতে সবসুদ্ধ রয়েছে ছ' জন লোক— বুশ, তার স্ত্রী ক্লারা, শ্রীমান উইলি, বুশের বন্ধু

স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক অমায়িক স্বল্পভাষী হান্‌স উলরিখ, ডঃ শেরিং ও তাঁর পরিচারিকা—নাম বোধহয় মারিয়া। এ ছাড়া দু'জন পুলিশের লোক বাড়িটাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে।

শেরিং রয়েছে পুব দিকের একটা ঘরে। আমাদের দু'জনের ঘরের মধ্যে রয়েছে ল্যান্ডিং ও একতলায় যাবার সিঁড়ি। আমি অবিশ্যি এসেই শেরিংকে একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। মাঝারি হাইটের মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, মাথার সোনালি চুলের পিছন দিকে টাক পড়ে গেছে। মুখটা চৌকো ও গোলের মাঝামাঝি। তাকে যখন দেখলাম, তখন সে জানালার ধারের একটা চেয়ারে বসে হাতে একটা কাঠের পুতুল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বুঝলাম, ঘরে লোক ঢুকলে উঠে দাঁড়ানোর সাধারণ সাহেবি কেতাটাও সে ভুলে গেছে। চোখের চাহনি দেখে কী রকম খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি চশমা পর?'

শেরিং-এর বাঁ হাতটা আপনা থেকেই চোখের কাছে উঠে এসে আবার নেমে গেল। বুশ বলল, 'চশমাটা ভেঙে গেছে। আর একটা বানাতে দেওয়া হয়েছে।'

শেরিংকে দেখে এসে আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। এ কথা সে কথার পর বুশ সলজ্জভাবে বলল, 'সত্যি বলতে কী, আমি যে তোমার যন্ত্রটা সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম, তা নয়। কতকটা আমার স্ত্রীর অনুরোধেই তোমাকে আমি টেলিগ্রামটা করি।'

'তোমার স্ত্রীও কি বৈজ্ঞানিক ?' আমি ক্লারার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্নটা করলাম। ক্লারাই হেসে উত্তর দিল—

'একেবারেই না। আমি আমার স্বামীর সেক্রেটারির কাজ করি। আমি চাইছিলাম তুমি আস, কারণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা। তোমার দেশের বিষয়ে অনেক বই পড়েছি আমি, অনেক কিছু জানি।'

বুশের যদি আমার যন্ত্র সম্বন্ধে কোনও সংশয় থেকে থাকে তো সেটা আজকের মধ্যেই কেটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আজ বিকেলে শেরিং-এর স্মৃতির বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা হবে।

এবার ড্রাইভারের কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। বুশ বলল, 'পুলিশ তদন্ত করছে। দুটি জায়গার একটিতে ড্রাইভার লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা হল দুর্ঘটনার জায়গার সাড়ে চার কিলোমিটার পশ্চিমে— নাম রেমুস, আর একটা হল সাড়ে তিন কিলোমিটার পুবে— নাম শ্লাইন্‌স। দুটো জায়গাতেই অনুসন্ধান চলছে ; তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে বনবাদাড়েও খোঁজা হচ্ছে।'

'দুর্ঘটনার জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে ?'

'পঁচাশি কিলোমিটার। সে ড্রাইভারকে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতেই হবে, কারণ, ও দিকে রাত্রে বরফ পড়ে। ভয় হয়, তার যদি কোনও শাকরেদ থেকে থাকে এবং ড্রাইভার যদি কাগজপত্রগুলো তাকে চালান করে দিয়ে থাকে।'

৮ই মার্চ, রাত সাড়ে দশটা

ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাতাসের শনশন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বুশ আজ আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত। এখন বলা শক্ত, কে আমার বড় ভক্ত—সে, না তার স্ত্রী।

আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা আমার যন্ত্র নিয়ে শেরিং-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। সে তখনও সেই চেয়ারে গুম হয়ে বসে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইল। বুশ তাকে অভিবাদন জানিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বলল, 'আজ আমরা তোমাকে একটা টুপি পরাব, কেমন ? তোমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি ওই চেয়ারে যেমনভাবে বসে আছ, সেইভাবেই বসে থাকবে।'

'টুপি ? কী রকম টুপি ?' শেরিং তার গম্ভীর অথচ সুরেলা গলায় একটু যেন অসোয়াস্তির সঙ্গেই প্রশ্নটা করল।

'এই যে, দেখো না।'

আমি ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বার করলাম। বুশ সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে শেরিং-এর হাতে দিল। শেরিং সেটাকে সকালের খেলনাটার মতো করেই নেড়েচেড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে দিল।

'এতে ব্যথা লাগবে না তো ? সে দিনের ইঞ্জেকশনে কিন্তু ব্যথা লেগেছিল।'

ব্যথা লাগবে না কথা দেওয়াতে সে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাত দুটোকে চেয়ারের পাশে নামিয়ে দিল। তার ঘাড়ে একটা জায়গায় ক্ষতের উপরে প্লাস্টার ছাড়া শরীরের অনাবৃত অংশে আর কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখলাম না।

শেরিংকে হেলমেট পরাতে কোনও অসুবিধা হল না। তারপর লাল বোতামটা টিপতেই হেলমেট-সংলগ্ন ব্যাটারিটা চালু হয়ে গেল। শেরিং একটা কাঁপুনি দিয়ে শরীরটাকে কাঠের মতো শক্ত ও অনড় করে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঘরের ভিতরে এখন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। এক শেরিং ছাড়া প্রত্যেকেরই দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ক্লারা দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে। নার্স খাটের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে শেরিং-এর দিকে চেয়ে আছে। বুশ ও উলরিখ শেরিং-এর চেয়ারের দু' পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আমি বুশকে মৃদু স্বরে বললাম, 'তুমি প্রশ্ন করতে চাও ? না আমি করব ? তুমি করলেও কাজ হবে কিন্তু।'

'তুমিই শুরু করো।'

আমি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টুল নিয়ে শেরিং-এর মুখোমুখি বসলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম—

'তোমার নাম কী ?'

শেরিং-এর ঠোঁট নড়ল। চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় উত্তর এল।

'হিয়েরোনিমাস হাইনরিখ শেরিং।'

'এই প্রথম !'—রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল বুশ—'এই প্রথম নিজের নাম বলেছে !'

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম।

'তোমার পেশা কী ?'

'পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।'

'তোমার জন্ম কোথায় ?'

'অস্ট্রিয়া।'

'কোন শহরে ?'

'ইন্‌স্‌ব্রুক।'

আমি বুশের দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলাম। বুশ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল—মিলছে। আমি আবার শেরিং-এর দিকে ফিরলাম।

'তোমার বাবার নাম কী ?'

'কার্ল ডিট্রিখ শেরিং।'

'তোমার আর ভাইবোন আছে ?'

'ছোট বোন আছে একটি। বড় ভাই মারা গেছে।'

'কবে মারা গেছে ?'

'প্রথম মহাযুদ্ধে। পয়লা অক্টোবর, উনিশশো সতেরো।'

আমি প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়মুগ্ধ বুশের দিকে চেয়ে তার মৃদু মৃদু মাথা নাড়া থেকে বুঝে নিচ্ছি, শেরিং-এর উত্তরগুলো সব মিলে যাচ্ছে।

'তুমি লান্ডেক গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে ?'

'প্রোফেসর লুবিনের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'কী কাজ ?'

'গবেষণা।'

'কী বিষয় ?'

'বি-এক্স থ্রি সেভন সেভন।'

বুশ ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, ওটা হচ্ছে গবেষণাটির সাংকেতিক নাম। আমি প্রশ্নে চলে গেলাম।

'সেই গবেষণার কাজ কি শেষ হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'সফল হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'গবেষণার বিষয়টা কী ছিল ?'

'আমরা একটা নতুন ধরনের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি করার ফরমুলা বার করেছিলাম।'

'কাজ শেষ করে তোমরা ওয়ালেনস্টাট আসছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে গবেষণার কাগজপত্র ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ফরমুলাও ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল ?'

বুশ আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি জানি কেন। কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি, শেরিং-এর মধ্যে একটা চাপা উশখুশে ভাব। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল। একবার যেন চোখের পাতা পড়ো পড়ো হল। কপালের শিরাগুলোও যেন ফুলে উঠেছে।

'আমি...আমি...'

শেরিং-এর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। আমার বিশ্বাস, গোপনীয় গবেষণার বিষয়টা প্রকাশ করে ফেলে ওর মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব জেগে উঠেছে।

আমি সবুজ বোতাম টিপে ব্যাটারি বন্ধ করে দিলাম। এই অবস্থায় আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। বাকিটা কাল হবে।

হেলমেট খুলে নিতেই শেরিং-এর মাথা পিছনে হেলে পড়ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে পরমুহূর্তেই আবার চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'চুরুট...একটা চুরুট...'

আমি শেরিং-এর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বুশ যেন অপ্রস্তুত। গলা খাকরিয়ে বলল, 'চুরুট তো নেই। এ-বাড়িতে কেউ চুরুট খায় না। সিগারেট খাবে ?'

উলরিখ তার পকেট থেকে সিগারেট বার করে এগিয়ে দিয়েছে। শেরিং সিগারেট নিল না।

আমি বললাম, 'তোমার কাছে কি তোমার নিজের কোনও চুরুটের বাক্স ছিল ?'

'হ্যাঁ, ছিল !' বলল শেরিং। সে যেন ক্লান্ত, অস্থির।

'কালো রঙের কেস কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তা হলে সেটা উইলির কাছে আছে। ক্লারা, একবার খোঁজ করে দেখবে কি ?'

ক্লারা তৎক্ষণাৎ তার ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

নার্স শেরিং-এর হাত ধরে তুলে, তাকে খাটে শুইয়ে দিল। বুশ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল, 'এবার তোমার মনে পড়েছে তো ?'

উত্তরে শেরিং যেন অবাক হয়ে বুশের দিকে চাইল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'কী মনে পড়েছে ?'

শেরিং-এর এই পালটা প্রশ্ন আমার মোটেই ভাল লাগল না। বুশও যেন হতভম্ব। সে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সহজভাবেই বলল, 'তুমি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিয়েছ।'

'কী প্রশ্ন ? কী প্রশ্ন করেছ আমাকে ?'

এবার আমি গত কয়েক মিনিট ধরে যে প্রশ্নোত্তর চলেছে, তার একটা বিবরণ শেরিংকে দিলাম। শেরিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর তার ডান হাতটা আলতো করে নিজের মাথার উপর রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমার মাথায় কী পরিয়েছিলে ?'

'কেন বলো তো ?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অজস্র পিন ফুটছে।'

'তোমার মাথায় এমনিতেই চোট লেগেছিল। পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় তুমি মাথায় চোট পাও, তার ফলে তোমার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়।'

শেরিং বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কী সব বলছ তুমি। পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ব কেন ?'

আমরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ক্লারা ফিরে এসেছে। তার হাতে আমার দেখা চুরুটের কেস। সে সেটা শেরিং-এর হাতে দিয়ে বিনীতভাবে বলল, 'আমার ছেলে কখন যেন এটা নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

বুশ আবার গলা খাকরিয়ে বলল, 'তুমি যে চুরুট খাও সে কথাটা মনে পড়েছে নিশ্চয়ই ?'

চুরুটের কেস হাতে নিয়ে শেরিং-এর চোখ বুজে এল। তাকে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এবার এঘর থেকে চলে যেতে হবে।

রিমেমব্রেন যন্ত্র ব্যাগে পুরে নিয়ে আমরা চারজন এসে বৈঠকখানায় বসলাম। খুশি ও খটকা মেশানো অদ্ভুত একটা অবস্থা আমার মনের। হেলমেটপরা অবস্থায় হারানো স্মৃতি ফিরে এলে হেলমেট খোলার পর সে স্মৃতি আবার হারিয়ে যাবে কেন ? শেরিং-এর মাথায় কি তা হলে খুব বেশিরকম কোনও গণ্ডগোল হয়েছে ?

এদের তিনজনকে কিন্তু ততটা হতাশ মনে হচ্ছে না।

উলরিখ তো যন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল, 'এটা যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেখানে স্মৃতির ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে পর পর এতগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া কি সহজ কথা ?'

বুশ বলল, 'আসলে মনের দরজা এমনভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সেটা খুলেও খুলছে না। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে কালকের জন্য অপেক্ষা করা। কাল আবার ওকে টুপি পরাতে হবে। আমাদের দিক থেকে কাজটা হবে শুধু প্রশ্নের উত্তর আদায় করা। অ্যাক্সিডেন্টের আগে গাড়িতে কী ঘটেছিল সেটা জানা দরকার। বাকি কাজ করবে পুলিশে।'

আটটা নাগাদ বুশ একবার পুলিশে টেলিফোন করে খবর দিল। ড্রাইভার হাইন্‌ৎস

নয়মানের কোনও পাত্তা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা হলে কি বি-এক্স থ্রি সেভন সেভনের ফরমুলা সমেত নয়মানের তুষারসমাধি হল।

৯ই মার্চ

কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত ঘুম আসছে না দেখে শেষটায় আমারই তৈরি সম্‌নোলিনের বড়ি খেয়ে একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা গাঢ় ঘুম হল। আজ সকালে উঠেই আমার যন্ত্রটা একটু নেড়েচেড়ে তাতে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কি না দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে কাজটা করার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি শেরিং-এর নার্স। ভদ্রমহিলা রীতিমতো উত্তেজিত।

'ডঃ শেরিং তোমাকে ডাকছেন। খুব বিশেষ দরকার।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'খুব ভাল। রাত্রে ভাল ঘুমিয়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণাটাও নেই। একেবারে অন্য মানুষ।'

আমি আলখাল্লা পরা অবস্থাতেই শেরিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে ইংরিজিতে 'গুড মর্নিং' বলল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সমস্ত স্মৃতি ফিরে এসেছে। আশ্চর্য যন্ত্র তোমার। শুধু একটা কথা। কাল তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে যা বলেছি, সেটা তোমাদের গোপন রাখতে হবে।'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'আরেকটা কথা। লুবিনের কী হল জানার আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি জানতে চাই সে কোথায়। সেও কি জখম হয়ে পড়ে আছে?'

'না। লুবিন মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

শেরিং-এর চোখ কপালে উঠে গেল। আমি বললাম, 'তুমি যে বেঁচেছ, সেটাও নেহাতই কপাল জোরে।'

'আর কাগজপত্র?' শেরিং ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

'কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কাগজপত্রের সঙ্গে ড্রাইভারও উধাও। এ ব্যাপারে তুমি কোনও আলোকপাত করতে পার কি?'

শেরিং ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'তা পারি বই কী।'

আমি চেয়ারটা তার খাটের কাছে এগিয়ে নিয়ে বসলাম। এ বাড়ির লোকজনের বোধ হয় এখনও ঘুম ভাঙেনি। তা হোক; সুযোগ যখন এসেছে, তখন কথা চালিয়ে যাওয়াই উচিত। বললাম, 'বলো তো দেখি, আসল ঘটনাটা কী।'

শেরিং বলল, 'আমরা লান্ডেক শহর থেকে রওনা হয়ে ফিন্‌স্টেরমুন্‌ৎসে সীমানা পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডে প্রবেশ করে কয়েক কিলোমিটার যেতেই এসে পড়ল শ্লাইন্‌স নামে একটা ছোট্ট শহর। সেখানে গাড়ি মিনিট পনেরোর জন্য থামে। আমরা একটা দোকানে বসে বিয়ার খেয়ে আবার রওনা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে কী যেন গণ্ডগোল হওয়ায় ড্রাইভার নয়মান গাড়ি থামায়। তারপর নেমে গিয়ে সে বনেট খুলে কী যেন দেখে লুবিনকে ডাক দেয়। লুবিন নেমে নয়মানের দিকে এগিয়ে যেতেই নয়মান তাকে একটা রেঞ্চ দিয়ে

মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে। স্বভাবতই আমিও তখন নামি। কিন্তু নয়মান শক্তিশালী লোক। ধস্তাধস্তিতে আমি হেরে যাই, সে আমারও মাথায় রেঞ্চের বাড়ি মেরে আমায় অজ্ঞান করে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।'

আমি বললাম, 'পরের অংশ তো সহজেই অনুমান করা যায়। নয়মান তোমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলে দিয়ে গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে পালায়।'

টেলিফোন বাজার একটা আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই শুনেছিলাম, এখন শুনলাম কাঠের মেঝের উপর দ্রুত পা ফেলার শব্দ। বুশ দৌড়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় খাদের মধ্যে কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। লেখা প্রায় মুছে গেছে, কিন্তু সেটা কী কাগজ, তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না।'

'তা হলে ফরমুলা হারায়নি ?' শেরিং চেঁচিয়ে উঠল।

শেরিং-এর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বুশ রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা। আমি তাকে সকালের ব্যাপারটা বলে দিলাম। বুশ বলল, 'তার মানে বুঝতে পারছ তো ?— নয়মান হয়তো ফরমুলা নেয়নি। শুধু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দামি জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।'

'সেটা কী করে বলছ তোমরা', শেরিং ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল— 'গবেষণা সংক্রান্ত কাগজ ছাড়া অন্য অদরকারি কাগজও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। খাদে যে কাগজ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে তো গবেষণার কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।'

শেরিং ঠিকই বলেছে। কতগুলো লেখা ধুয়ে যাওয়া কাগজ থেকে এটা মোটেই প্রমাণ হয় না যে নয়মান ফরমুলা নেয়নি। যাই হোক, আমি আর বুশ স্থির করলাম যে, উলরিখকে শেরিং-এর সঙ্গে রেখে আমরা দু'জন ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে যাব অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়।

আরও কিছু কাগজ পাওয়া যেতে পারে, এবং তার মধ্যে ফরমুলাটাও থাকতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে আমাদের মনে। রেমুস আর শ্লাইন্‌সের মধ্যবর্তী অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। খুব বেশি তো সোয়া ঘন্টা লাগবে পৌঁছাতে। আমার মতে ড্রাইভার খোঁজার চেয়েও বেশি জরুরি কাজ হচ্ছে কাগজ খোঁজা। লেখা ধুয়ে মুছে গেলে ক্ষতি নেই। সে লেখা পাঠোদ্ধার করার মতো রাসায়নিক কায়দা আমার জানা আছে।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কেন জানি না কিছুক্ষণ থেকে আমার মনটা মাঝে মাঝে খচ খচ করে উঠছে। কোথায় যেন ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কী, সেটা বুঝতে পারছি না।

কেবল একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমার যন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল নেই।

১০ই মার্চ, রাত ১২টা

একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোর এখনও পুরোপুরি কাটেনি, কাটবে সেই গিরিডিতে আমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গিয়ে। এমন ছবির মতো সুন্দর দেশে এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

গতকাল সকালে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমি, বুশ আর সুইস পুলিশের হান্‌স বার্গার যখন দুর্ঘটনার জায়গায় পৌঁছলাম, তখন আমার ঘড়িতে পৌনে ন'টা। রাস্তার এখানে সেখানে বরফ জমে আছে, চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে আর চুড়োয় বরফ। গাড়ির কাচ তোলা থাকলেও গাছপালার অস্থির ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম বেশ জোরে হাওয়া বইছে। বুশই গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে আমি, পিছনের সিটে বার্গার।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে লাগল এক ঘন্টা দশ মিনিট। রেমুসে একবার মিনিট তিনেকের জন্য থেমেছিলাম। সেখানে পুলিশের লোক ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম নয়মানের কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পুরোদমেই চলেছে, এমনকী নয়মানকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তার পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে সাড়ে তিন হাজার ফুট। নীচের দিকে চাইলে একটা সরু নদী দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে বললাম, কাগজপত্র যদি ওই নদীর জলে ভেসে গিয়ে থাকে, তা হলে আর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। রাস্তাটা এখানে এত চওড়া যে জোর করে ঠেলে না ফেললে, বা ড্রাইভারের হঠাৎ মাথা বিগড়ে না গেলে, গাড়ি খাদে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গায়ে পুলিশের লোক দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপরেও কিছু জিপ ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, খানাতল্লাশির কাজে কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। আমরাও দুজনে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম।

পায়েহাঁটা পথ রয়েছে, ঢালও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। দূর থেকে সুরেলা ঘণ্টার শব্দ পাচ্ছি ; বোধ হয় গোরু চরছে। সুইস গোরুর গলায় বড় বড় ঘণ্টা বাঁধা থাকে। তার শব্দ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলে।

গাড়ি যেখানে পড়েছিল, আর লুবিনের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, এই দুটো জায়গা আগে দেখা দরকার। এ দিকে ও দিকে বরফের শুভ্র কার্পেট বিছানো রয়েছে, মাঝে মাঝে ঝাউ, বিচ আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে বরফ মাটিতে খসে পড়ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুঁজেও এক টুকরো কাগজও পেলাম না। কিন্তু গাড়ির জায়গা

থেকে আরও প্রায় পাঁচশো ফুট নেমে গিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করলাম, সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

আবিষ্কারটা আমারই। সবাই মাটিতে খুঁজছে কাগজের টুকরো ; আমার দৃষ্টি কিন্তু গাছের ডালপাতা ফোকর ইত্যাদিও বাদ দিচ্ছে না। একটা ঘন পাতাওয়ালা ওক গাছের নীচে এসে দৃষ্টি উপরে তুলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট সাদা জিনিস চোখে পড়ল যেটা কাগজও নয়, বরফও নয়। আমার দৃষ্টি যে কোনও পুলিশের দৃষ্টির চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি তীক্ষ্ণ। দেখেই বুঝলাম ওটা একটা কাপড়ের অংশ। বার্গারকে ইশারা করে কাছে ডেকে গাছের দিকে আঙুল দেখালাম। সে সেটা দেখামাত্র আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডাল বেয়ে উপরে উঠে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে উঠেছে তার মাতৃভাষা জার্মানে—

'ডা ইস্ট আইনে লাইখে !'

অর্থাৎ— এ যে দেখছি একটা মৃতদেহ !

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ নীচে নেমে এল। বরফের দেশ বলেই মৃত্যুর এত দিন পরেও দেহ প্রায় অবিকৃত রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ হল ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের মৃতদেহ। তার কোটের পকেটে রয়েছে তার গাড়ির লাইসেন্স ও তার ব্যক্তিগত আইডেন্টিটি কার্ড। নয়মানেরও হাড়গোড় ভেঙেছে, হাতেমুখে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। সেও যে গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে এই ওক গাছের ডালপালার ভিতরে এত দিন মরে পড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তা হলে কি নয়মান লুবিন ও শেরিংকে অজ্ঞান করে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলার সময় নিজেই পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল ? নাকি অন্য কোনও অচেনা লোক এসে তার এই দশা করেছে ? যাই হোক না কেন, নয়মানকে খোঁজার জন্য পুলিশকে আর মেহনত করতে হবে না।

এটাও বলে রাখি যে নয়মানের জামার পকেটে গবেষণা সংক্রান্ত কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি। সে কাগজ যদি খাদের মধ্যে পাওয়া যায় তো ভাল, না হলে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের মামলা এখানেই শেষ...

* * *

আমরা এগারোটার সময় ওয়ালেনস্টার্ট রওনা দিলাম। আমাদের দুজনেরই দেহমন অবসন্ন। সেটা কিছুটা পাহাড়ে ওঠানামার পরিশ্রমের জন্য, কিছুটা দুর্ঘটনার কথা মনে করে। সেই সঙ্গে কাল রাত্রের মতো আজও কী কারণে যেন আমার মনের ভিতরটা খচ খচ করছে। কী একটা জিনিস, বা জিনিসের অভাব লক্ষ করে মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা আমার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সঙ্গে রিমেমব্রেন যন্ত্রটা আছে— ওটা হাতছাড়া করতে মন চায় না— একবার মনে হল যন্ত্রটা পরে বুশকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়ে দেখি কী হয়, কিন্তু তারপরেই খেয়াল হল, কী ধরনের প্রশ্ন করলে স্মৃতিটা ফিরে আসবে, সেটাও আমার জানা নেই। অগত্যা চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হল।

বাড়ি পৌঁছানোর কিছু আগে থেকেই মেঘ করেছিল, গাড়ি গেটের সামনে থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

শেরিং নয়মানের মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা শুনে আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, 'দুটি লোকের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে সাত বছরের পরিশ্রম পণ্ড।' তারপর একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এক হিসেবে ভালই হয়েছে।'

আমরা একটু অবাক হয়েই শেরিং-এর দিকে চাইলাম। তার দৃষ্টিতে একটা উদাস ভাব দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। লুবিনই প্রথমে করে প্রস্তাবটা। আমি গোড়ায় আপত্তি করলেও, পরে নিজের অজান্তেই যেন জড়িয়ে পড়ি, কারণ লুবিন ছিল কলেজজীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

শেরিং একটু থেমে আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল, 'এই যন্ত্রের প্রেরণা কোত্থেকে এসেছিল জান? তুমি ভারতীয়, তাই তোমাকেই বিশেষ করে বলছি। লুবিন সংস্কৃত জানত। বার্লিনের একটি সংগ্রহশালায় রাখা একটি আশ্চর্য সংস্কৃত পুঁথি লুবিন পড়েছিল কিছুকাল আগে। এই পুঁথির নাম সমরাঙ্গনসূত্রম। এতে যে কত রকম যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তার হিসেব নেই। সেই পুঁথি পড়েই লুবিনের মাথায় এই অস্ত্রের পরিকল্পনা আসে। ...যাক গে, যা হয়েছে তাতে হয়তো আখেরে মঙ্গলই হবে।'

আমি সমরাঙ্গনসূত্রমের নাম শুনেছি, কিন্তু সেটা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। অবিশ্যি ভারতীয়রা যে মারণাস্ত্র নিয়ে এককালে বিশেষভাবে চিন্তা করেছে, সেটা তো মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়।

শেরিংকে আর এখানে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না। আমরা যখন বেরিয়েছিলাম, সেই সময় সে নাকি আল্‌টডর্ফ শহরে তার এক বন্ধুকে ফোন করে বলেছে তাকে যেন এসে নিয়ে যায়। আল্‌টডর্ফ এখান থেকে পশ্চিমে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। শেরিং-এর বন্ধু বলেছে বিকেলের দিকে আসবে।

সারা দুপুর আমরা চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা বৈঠকখানায় বসে গল্পগুজব করলাম। সাড়ে তিনটের সময় একটা হাল ফ্যাশানের লাল মোটরগাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার থেকে নামলেন একটি বছর চল্লিশেকের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, লম্বায় ছ' ফুটের ওপর, পরনে চামড়ার জার্কিন ও কর্ডের প্যান্ট। রোদেপোড়া চেহারা দেখে আন্দাজ করেছিলাম, পরে শুনলাম সত্যিই এঁর পাহাড়ে ওঠার খুব শখ, সুইটজারল্যান্ডের উচ্চতম তুষারশৃঙ্গ মন্টে রোজায় চড়েছেন বারপাঁচেক— যদিও পেশা হল ওকালতি। বলা বাহুল্য ইনিই শেরিং-এর বন্ধু, নাম পিটার ফ্রিক্। শেরিং আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আর একবার আমার যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আল্‌টডর্ফের দিকে রওনা দিয়ে দিল।

সে যাবার মিনিট দশেক পরে— সবেমাত্র ক্লারা সকলের জন্য লেমনটি ও কেক এনে টেবিলে রেখেছে— এমন সময় হঠাৎ ভেলকির মতো আমার মনের সেই অসোয়াস্তির কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর হওয়ামাত্র আমি সবাইকে চমকে দিয়ে তড়াক করে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুশের দিকে ফিরে বললাম, 'এক্ষুনি চলো। আল্‌টডর্ফ যেতে হবে।'

'তার মানে?' উলরিখ আর বুশ একসঙ্গে বলে উঠল।

'মানে পরে হবে। আর এক মুহূর্ত সময় নেই!'

আমার এই বয়সে এই তৎপরতা দেখেই বোধহয় বুশ ও উলরিখ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিনটে করে ধাপ উঠতে উঠতে বুশকে বললাম, 'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে? আমারটা আনিনি।'

'একটা লুগার অটোম্যাটিক আছে।'

'ওটা নিয়ে নাও। আর পুলিশের লোকটি থাকলে তাকেও বলে দাও সঙ্গে আসতে। আর আল্‌টডর্ফেও জানিয়ে দাও— সে দিকেও যেন পুলিশ তৈরি থাকে।'

আমার যন্ত্রটাকে ঘর থেকে নিয়ে আমরা চারজন পুরুষ বুশের গাড়িতে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটলাম আল্‌টডর্ফের উদ্দেশে। বুশ মোটর চালনায় সিদ্ধহস্ত— স্টিয়ারিং ধরে এক মিনিটের মধ্যে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পিড তুলে দিল। এ দেশে যারা গাড়ির সামনের সিটে বসে, তাদের প্লেনযাত্রীর মতো কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে হয়। এ গাড়িটা তো এমনভাবে তৈরি যে বেল্ট না বাঁধলে গাড়ি চলেই না। শুধু তাই না— গাড়িতে যদি আচমকা ব্রেক কষা হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ ড্যাশবোর্ডের দুটো খুপরি থেকে দুটো নরম তুলোর মতো জিনিস লাফিয়ে বেরিয়ে এসে চালক ও যাত্রীকে হুমড়ি খেয়ে নাকমুখ থ্যাঁতলানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

আমাদের অবিশ্যি আচমকা ব্রেক কষার প্রয়োজন হয়নি। ত্রিশ কিলোমিটারের ফলক পেরোবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা শেরিং-এর লাল গাড়ি দেখতে পেলাম। তার চলার মেজাজে চালকের নিরুদ্বেগ ভাবটা স্পষ্ট। আমি বললাম, 'ওটাকে পেরিয়ে গিয়ে থামো।'

বুশ হর্ন দিতে দিতে লাল গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে খানিক দূর গিয়ে হাত দেখিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে ট্যারচা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। ফলে শেরিং-এর গাড়ি বাধ্য হয়েই থেমে গেল।

আমরা চারজন গাড়ি থেকে নামলাম। শেরিং আর তার বন্ধুও নেমে অবাক মুখ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার?' শেরিং প্রশ্ন করল।

পথে আসার সময় আমাদের চারজনের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। হয়তো আমার গম্ভীরভাব দেখেই অন্য তিনজন সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কাজেই আমরা কেন যে এই অভিযানে বেরিয়েছি, সেটা একমাত্র আমিই জানি, আর তাই কথাও বলতে হবে আমাকেই।

আমি এগিয়ে গেলাম। শেরিং যতই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করুক না কেন, তার ঠোঁটের ফ্যাকাশে শুকনো ভাবটা সে গোপন করতে পারছে না। তার তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু পিটার ফ্রিক্।

'একটা চুরুট খেতে ইচ্ছে করল', আমি শান্তভাবে বললাম, 'কাল তোমার ডাচ চুরুট পান করে আমার নেশা হয়ে গেছে। আছে তো চুরুটের কেসটা?'

আমার এই সহজভাবে বলা সামান্য কয়েকটা কথায় যেন ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ হল। শেরিং-এর বন্ধুর হাতে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একটা রিভলভার, আর সেই মুহূর্তেই সেটা গর্জিয়ে উঠল। আমি অনুভব করলাম আমার ডান কনুই ঘেঁষে গুলিটা গিয়ে লাগল বুশের মার্সেডিস গাড়ির ছাতের একটা কোণে। কিন্তু সে রিভলভার আর এখন পিটার ফ্রিকের হাতে নেই, কারণ দ্বিতীয় আর একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিকের রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে, আর ফ্রিক্ তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা চেপে মুখ বিকৃত করে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছে।

আর শেরিং? সে একটা অমানুষিক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে উলটোমুখে দৌড় লাগাতেই বুশ ও উলরিখ তিরবেগে ছুটে গিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে তাকে বগলদাবা করে ফেলল। আর আমি— জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু— আমার অদ্বিতীয় আবিষ্কার রিমেমব্রেন যন্ত্রটি শেরিং-এর মাথায় পরিয়ে বোতাম টিপে ব্যাটারি চালু করে দিলাম।

শেরিং দুজনের হাতে বন্দি হয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তার নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে মনে হয়, সে দূরে তুষারাবৃত পাহাড়ের চুড়োর দিকে চেয়ে ধ্যান করছে।

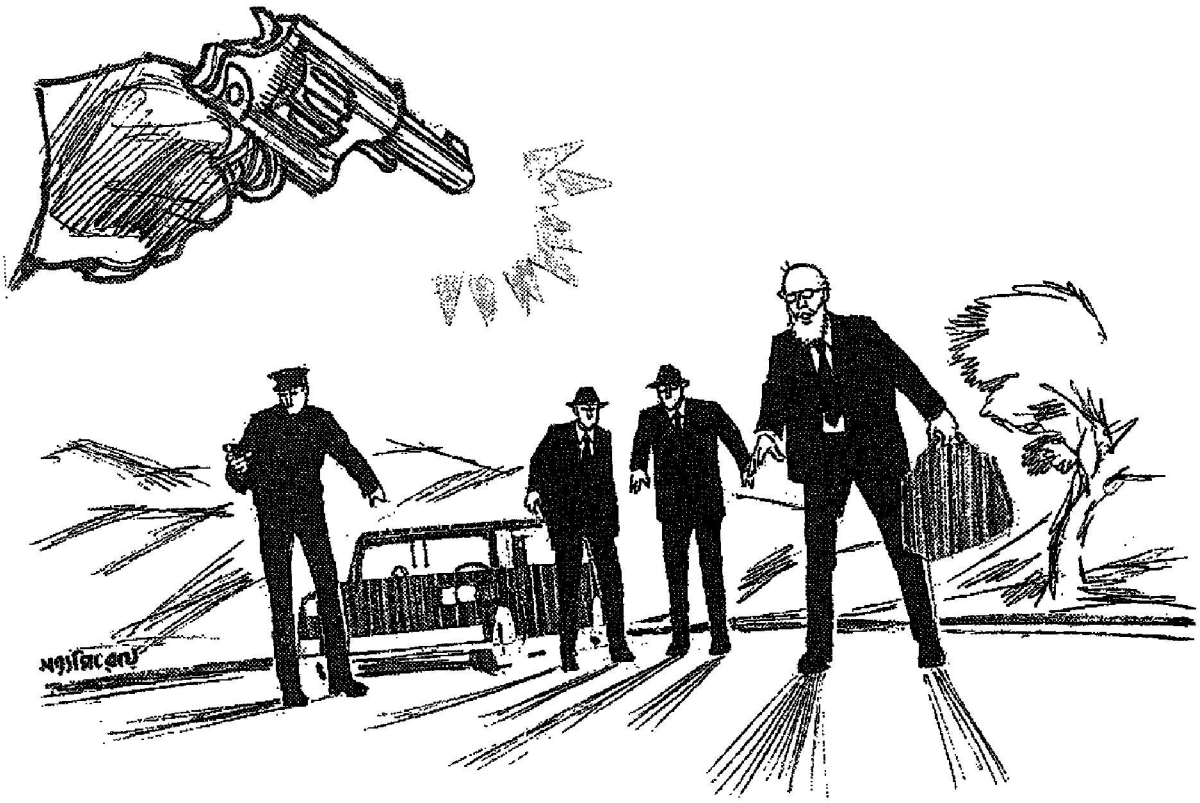

এবার আমার খেলা।

আমি প্রশ্ন করলাম শেরিং-কে উদ্দেশ্য করে।

'ডক্টর লুবিন কীভাবে মরলেন ?'

'দম আটকে।'

'তুমি মেরেছিলে তাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে ?'

'টুঁটি টিপে।'

'তখন গাড়ি চলছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার নয়মান কীভাবে মরল ?'

'নয়মানের সামনে আয়না ছিল। আয়নায় সে লুবিনের হত্যাদৃশ্য দেখে। সেই সময় তার স্টিয়ারিং ঘুরে যায়। গাড়ি খাদে পড়ে।'

'তার সঙ্গে তুমিও পড় ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ভেবেছিলে লুবিন ও নয়মানকে খুন করে তাদের খাদে ফেলে দেবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ফরমুলা নিয়ে পালাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে তুমি ওটা দিয়ে ?'

'বিক্রি করতাম।'

priyobanglaboi.blogspot.com

'কাকে ?'

'যে বেশি দাম দেবে, তাকে।'

'ফরমুলার কাগজ কি তোমার কাছে আছে ?'

'না।'

'তবে কী আছে ?'

'টেপ।'

'তাতে ফরমুলা রেকর্ড করা আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে টেপ ?'

'চুরুটের কেসে।'

'ওটা কি আসলে একটা টেপ রেকর্ডার ?'

'হ্যাঁ।'

আমি শেরিং-এর মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিলাম। পুলিশের লোকটি ভিজে রাস্তার উপর জুতোর শব্দ তুলে শেরিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

*　　*　　*

এখন মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য এই মস্তিষ্ক জিনিসটা, আর কী অদ্ভুত এই স্মৃতির খেলা। কাল শেরিং চুরুট চাইল, ক্লারা তাকে কেসটা এনে দিল, কিন্তু সে চুরুট খেল না। তখনই ব্যাপারটা পুরোপুরি আঁচ করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আজ সকালেও তার ঘরে চুরুটের কোনও গন্ধ বা কোনও চিহ্ন দেখিনি। চুরুটের কেসটা নিয়মিত খাটের পাশের টেবিলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা ছিল না। আজ দুপুরে এতক্ষণ বসে গল্প করলাম, কিন্তু তাও শেরিং চুরুট খেল না।

গান মেটালের তৈরি কেসটা এখন আমার ঘরে আমার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। এর ঢাকনাটা খুললে বেরোয় চুরুট, আর নীচের দিকে একটা প্রায়-অদৃশ্য বোতাম টিপলে তলাটা খুলে গিয়ে বেরোয় মাইক্রোফোন সমেত একটা খুদে টেপ রেকর্ডার। টেপটা চালিয়ে দেখেছি, তাতে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের সব তথ্যই রেকর্ড করা আছে শেরিং-এর নিজের গলায়। এরই উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করা যায়, তা হলে শেরিং-এর এই অপদার্থ ফরমুলাটা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উইলির গলা না ? সে আবার সুর করে ছড়া কাটছে।

মাইক্রোফোনটা বার করে রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮১

boiRboi.blogspot.com